রূপকথা চর্চায় সমস্যা ও বাংলা রূপকথার প্রাচীনত্ব

অরুণকুমার রায়

ভারততত্ত্বের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় একশো বছরের অধিকাকাল পূর্বে জার্মানদেশে যে ভারতীয় পুরাকাহিনি (Myths) গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল এই শতাব্দীর বর্তমান দশকে সেই দেশেরই সহায়তায় বাংলার রূপকথার (Marchen) প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়াস। যে বিশ্বের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে সেইজন্য সেই দেশ ও জাতির প্রতি যেমন আমরা কৃতজ্ঞ, তেমনি গৌরাবান্বিতও বটে। গত শতাব্দীর জার্মান পণ্ডিতদের কঠিন ও জটিল একক প্রয়াসকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেও আমাদের দ্বারা সম্পন্ন। বাংলা রূপকথার এই গবেষণাকে আরও অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি এই কারণে যে, এ কারোর একক প্রয়াসের ফল নয়। জার্মানি ও বাংলার শতাধিক তরুণ ও প্রবীণ মানুষের দশ বছরের অধিককালের যৌথ-উদ্যোগের এ এক নিঃস্বার্থ ফসল।

প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে আধুনিক অর্থে পুরাকাহিনি তথা লোকায়নের (Folklore) চর্চা ইংরেজ যুক্তিবাদী দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের (Francis Bacon, 1561-1626) দ্বারা শুরু হলেও এর উৎস-অনুসন্ধানের জন্য 'প্রাচ্যের দিকে মুখ ফেরাও' এই আওয়াজ প্রথম তুলেছিলেন জার্মান পণ্ডিত ক্রুজার (Creuzer : Symbolik und Mythologie, Leipzig, 1810-1812)—

> This secret wisdom passed from the Orient to Greece and became the kernel of all myths, which therefore contain the wisdom of antiquity in all allegorical form'—tr. literally.

ক্রুজারের এই যুগান্তকারী ইঙ্গিত পূর্ণায়ত হলো সমসাময়িক আর এক জার্মান মনীষীর অবদানে। পুরাকাহিনিচর্চা তখন জটিল আবর্তে দিশেহারা। এই বিভাগে সঠিক বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। জট খুলে দিলেন কে. ও. মুলার (K.O. Muller, 1797-1840) তাঁর বিখ্যাত 'Prolegomena zu einer wissenschaft licher Mythologie', 1825 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের শিরোনামের ইংরেজি হবে 'Preliminary Remarks on a Scientific Mythology'। মূলার বললেন, পুরাকাহিনি তথা লোকায়নচর্চা একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে করা চলে না। এর বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে নানাদিক থেকে। তবেই এর জটিলতা উন্মোচিত হবে। আধুনিক অর্থে কে. ও. মুলারকেই প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকায়নিক বলা চলে। এই মুলারের নির্দেশ অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে লোকায়নচর্চায় ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিদ্যাপীঠের (Schools) উদ্ভব হয়।

সকলেরই জানা আছে যে, ভারতবিদ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতমণ্ডলী এক সময়ে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই প্রভাব বিস্তারের বীজ নিহিত ছিল ফ্রান্জ বপ এর (Franz Bopp. 1791-1867) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে ইন্ডো-জার্মানিক ভাষাসমূহের সম্পর্ক-নির্ধারণের সূত্র আবিষ্কারের মধ্যে। ভারতীয় পুরাকাহিনি তথা লোকায়ন-চর্চায়ও বপের অনুসারীরা গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত নানা দিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশে তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি নাগরিকত্বের দিক থেকে জার্মান না হলেও বংশ এবং শিক্ষা-দীক্ষায় জার্মান। লোকায়ন-চর্চার ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠের এই অনন্য প্রতিভার অধিকারী হলেন ম্যাক্স-মুলার (Max Muller, 1823-1900)। মাত্র তেইশ বছর বয়সে মুলার জার্মানি ত্যাগ করে অক্সফোর্ডে আসেন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থগুলি তর্জমা করার জন্যে। দেশে তিনি আর ফিরে যাননি। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বাকি জীবন ইংরেজিতেই তিনি ভারততত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রকাশ করে গেছেন। লোকায়নচর্চার ইতিহাসে ম্যাক্স মুলারের সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো, তিনিই প্রথম ভারতীয় ও গ্রিক পুরাকাহিনির মধ্যে সম্পর্ক-বিশ্লেষণে ভাষাতত্ত্বের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এদেশে ম্যাক্স মুলার 'জার্মান পণ্ডিত' আখ্যা পেলেও বর্তমানের দুই জার্মানিতেই তিনি 'বৃটিশ পণ্ডিত' রূপে পরিচিত। ম্যাক্স মুলারের প্রভাব খোদ জার্মানিতেও বেশ কিছু পড়েছিল। একটা জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠও গড়ে ওঠে তখন। এই বিদ্যাপীঠের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন মান্হারডট (Mannhardt)। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে মান্হার্ডট 'Antike wald-und Feldkulte', 1877 (ইংরেজি তর্জমা করলে হবে 'Antique wood and Fieldcult') নামে একটি গ্রন্থপ্রকাশ করে পুরাকাহিনি ও লোকায়নচর্চায় মুলারীয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অসারতা প্রমাণ করলেন। ইতিপূর্বে নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও ইতিহাসের পণ্ডিতমণ্ডলী মুলারীয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর যে আঘাত হানছিলেন মান্হার্ডট এসে তাকে আরও জোরদার করলেন। এমনিভাবেই একদিন লোকায়নচর্চায় ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতাদের কবর রচনা হল।

ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্যের সাক্ষ্যপ্রমাণাদিকে ভিত্তি করে একশত বৎসর পূর্বে লোকায়নচর্চার যে ভাষাতাত্ত্বিক নিরিখ সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীব্যাপী পণ্ডিতমণ্ডলী তা চিরতরে বর্জন করলেন। নতুন জমানায় কেবল বিশ্লেষণী মানদণ্ডই পরিবর্তিত হয়নি, গবেষণার উপকরণেরও তারতম্য হয়েছে। একশত বৎসর পূর্বে গবেষণার প্রধান উপকরণ ছিল চিরায়ত লেখ্য-সাহিত্য, আর এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মৌখিক লোককাহিনিই লোকায়নচর্চার মুখ্য উপজীব্য। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের ধারকদের অনেকেই এগুলিকে ইংরাজিনবীশ আয়া ও পাদ্রীদের ইউরোপ থেকে আমদানী করা পরী-কাহিনি (Fairy Tales) দ্বারা প্রভাবিত স্বকপোলল্পিত কাহিনি বলে মনে করতেন। ইংরেজ ও ফরাসি পণ্ডিতমণ্ডলী সাম্রাজ্যবাদী-দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন ছিলেন ধরে নিলেও জার্মান মনীষীরাও এই বিভ্রান্তির বাইরে ছিলেন বলা চলে না। ১৮৯৩ সালে ইয়াকোব সংকলিত 'ভারতীয় রূপকথা' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিতপ্রবর ওয়েবার (Weber) সংকলককে স্টোক্স, ফ্রেরে, কিংসকোট, স্টিল-টেম্পল, ক্যাম্পবেল, ডেম্স ও নোলেস্ প্রমুখ লোকায়নিকদের 'সন্দেহজনক' (!) সংকলনগুলিকে

নির্বিচারে গ্রহণ করে 'ভারতীয়' আখ্যা দেওয়ার জন্য দোষারোপ করেন। এই কাহিনিগুলিকে আদৌ ভারতীয় বলা চলে কিনা ভেবার স্পষ্টভাবেই সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। অনুরূপ সিদ্ধান্ত সম্প্রতি জিপসী-লোককাহিনি সংকলন করতে গিয়েও পাওয়া গেছে। সকলেই জানেন, ইউরোপের সব দেশে বহুকাল থেকেই জিপসী বা রোমানীরা দলবদ্ধভাবে বাস করছে। এদের কথ্যভাষা রোমানি নিয়ে গবেষণা করে পণ্ডিতমণ্ডলী একমত হয়েছেন যে, এদের আদি নিবাস ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। জনৈক যুগোস্লাভ্ জিপসী লোকায়নবিদের সারাজীবনব্যাপী সংগৃহীত চার বাজার লোককাহিনি সম্পাদনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. মোডে দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে যুগোশ্লাভ, রুমানীয়, হাঙ্গেরীয়, চেকবুলগার এমনকি ইংরেজ লোকয়বিদ জ্যাকবও সিদ্ধান্ত করেছেন যে জিপসীদের নিজস্ব কোনো লোকসাহিত্য নেই, যে সব দেশে এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে সেখানকার মৌখিক কাহিনিই এরা আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে। কিন্তু ভারততত্ত্ববিদ ড. মোডে আবিষ্কার করেছেন যে এগুলির মূল প্রোথিত রয়েছে পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান অঞ্চলের প্রাচীন লোককাহিনির মধ্যে। এদেরই মুখে শুনে শুনে রুমানীয়, বুলগারীয়, যুগোশ্লাভ, হাঙ্গেরীয় চেক গ্রামীণ মানুষেরা পরবর্তীকালে নিজস্ব লোককাহিনি সৃষ্টি করেছে। এমন কি গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত বিশ্ববিখ্যাত জার্মান রূপকথা সংকলনের কাহিনিও এর ব্যতিক্রম না। অবশ্য এর দ্বারা আবার এই সিদ্ধান্ত করাও যুক্তিযুক্ত হবে না যে এইসব দেশগুলির নিজস্ব কোন লোকসাহিত্য নেই।

আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী কোনো ক্রমেই ভুল করেননি। কারণ ভারতীয় মৌখিক রূপকথার যে কোনো নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ পড়লেই গ্রিসের রূপকথা ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক লোককাহিনির আশ্চর্য এক সাদৃশ্য সকলেরই নজরে আসবে। সরাসরি ইউরোপ থেকে আমদানির সম্ভাবনা সর্বদা বিদ্যমান থাকলেও এ সমস্ত সাদৃশ্যের অধিকাংশের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি রূপকথার প্রকৃতি ও ইতিহাসের বিস্তৃত ও নিপুণ আলোচনা, সে-যুগে যা একেবারেই অসম্ভব ছিল। অধুনা আমরা অবহিত হয়েছি যে এক-এক ধরনের (Type) রূপকথা-মাত্রেরই নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। যদিও সে ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় কোনক্রমেই আমাদের জানা নেই। দীর্ঘদিন মুখে মুখে রয়েছে এবং ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়নি বলেই এসব মৌখিক-রূপকথাগুলিকে সাম্প্রতিক বলতে হবে, এ চিন্তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বরং এমন এক পুরনো মৌখিক ঐতিহ্যধারায় যাতে এরা ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগের লিপিবদ্ধ রূপকথা অপেক্ষাও প্রাচীনত্বের পর্যায়ে পড়ে, সে কথা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা দরকার। প্রাচীন যুগের লিপিবদ্ধ রূপকথাগুলিও, তা জাতক বা তার অনেক পরের কথাসরিৎসাগর যা থেকেই নেওয়া হোক না কেন, তারাও নিশ্চয়ই পূর্বতন কোনও মৌখিক রূপকথার উপকরণের ভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকবে। কাজেই আমাদের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে কোনও কোনও পণ্ডিতব্যক্তির কাছে গা-জুরি মনে হতেও পারে। স্বভাবতই তাঁদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পূর্বের সংগ্রাহকের লিপিবদ্ধ বাংলা বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের রূপকথাগুলি কি করে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে প্রতিপন্ন দু'হাজার বছরের প্রাচীন জাতকের ন্যায় রূপকথাসমূহ থেকেই প্রাচীনতর হতে পারে?

এখানেই আমরা লোকায়নের উপকরণসমূহের জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। কেবলমাত্র সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণাদির উপর নির্ভর করে এসব কাঁচামালের পর্যালোচনা চলে না। এদের ইতিহাস অনুশীলনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধ হ'ল হাঁড়ি-কলসী-হাতিয়ার ইত্যাদি পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর ন্যায় এরা কখনও বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে অবস্থান করে না। কাজেই প্রাচীনতম ইতিহাস থেকে এদের কেবল পরোক্ষভাবেই জানা যেতে পারে। আর জানা যায় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহের উপর এদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিচার করে। অর্থাৎ একটা বিশেষ যুগের উচ্চতর সংস্কৃতির নব নব রূপায়ণের মধ্যে থেকেই সেই দেশের অতীত লোকায়নের উপকরণসমূহ অনুসন্ধান করে নিতে হয়। সেই জন্যেই আধুনিক লোকায়নচর্চায় পুরাতত্ত্ব বিভাগ অন্তর্ভুক্ত চারুকলা-সমালোচনা পদ্ধতি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সুদূর পুরাকালে কয়েকজন রাজাও অভিজাতের নামে সঙ্গেই পরিচিত বলে যে সে-যুগের অগণিত অজ্ঞাতনামা জনসাধারণের কোনও অস্তিত্বই ছিল না একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি অতীত যুগের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞাতকে মোটেই তার অনস্তিত্বের প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যায় না। ঐতিহাসিক ঘটনা ও উপকরণাদি সর্বদাই স্বাগত। কিন্তু ঐতিহাসিক উপকরণের পারম্পর্যতার ফাঁক থেকে কখনই এ-যুক্তি অবতারণা করা চলে না যে এমন যুগ থাকতে পারে যার কোন ইতিহাস নেই। তবে একটি বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, এ-সব পারম্পর্যহীনতার ফাঁক পূরণের জন্য প্রচুর পরিশ্রম প্রয়োজন। আর সেইজন্য রূপকথার ইতিহাস আলোচনা খুবই আয়াসসাধ্য।

ইতিহাসের অতলস্পর্শিতার কথা ছেড়ে দিলেও, ভারতের ন্যায় এক বিরাট দেশের বিশাল ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। চিরায়ত ভারততত্ত্ব গবেষণায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে প্রভূত পরিমাণে উপেক্ষিত তার একটিমাত্র সহজ কারণই হল যে, যে-সব লেখ্য-সাহিত্যিক উপকরণের উপর এইসব গবেষণার সকল প্রয়াস নিবন্ধ ছিল তারা উচ্চতর সাংস্কৃতিক তলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে একটা পিণ্ডাকৃতি একীভূত রূপ গ্রহণ করেছিল। অথচ একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কোনও ক্ষেত্রেই সারাভারত জুড়ে এই একীভূত রূপ সম্ভব নয়। উচ্চতর সংস্কৃতির এই যেখানে অবস্থা সেখানে লোকসংস্কৃতিকে চিনে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধেই হয় না।

কেননা, লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গভীর এক আঞ্চলিকতার স্পর্শ, এই আঞ্চলিকতা একাধারে যেমন এর বলিষ্ঠতার পরিচায়ক, তেমনি এর দুর্বলতার নিদর্শনও বটে। সকল লোকসংস্কৃতিই পরস্পরের সঙ্গে সাধারণভাবে সম্পর্কিত হলেও নির্দিষ্ট লোকসংস্কৃতির উৎকর্ষ নির্ভর করে তার আঞ্চলিকতার ছাপ। একটি নিটোল স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে কোন কোনটির অগ্রাধিকারের উপর। লক্ষ করা গেছে যে, এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি লোকসংস্কৃতি যুগের পর যুগ একেবারে পাশের গ্রাম থেকেই স্বতন্ত্র এক অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করে চলেছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা বা অঞ্চলের পোড়ামাটির পুতুলের বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই এ পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।

কিন্তু রূপকথার ক্ষেত্র একটু স্বতন্ত্র। ভারতের অধিকাংশ মৌখিক-রূপকথা কয়েকটি মাত্র গণ্ডিবদ্ধ অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত, কিন্তু কাঠামো যা বিন্যাসে এদের অনেকগুলিতেই এমন

যথেষ্ট সুচারু বর্ণনা দেওয়া নেই যাতে এদের প্রত্যেকটির উৎসস্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা জন্মাতে পারে। এই জন্যেই শ্রীমতী স্টোক্স এর এমন গুরুত্বপূর্ণ রূপকথার সংকলনটি (Miss M. Stokes : 'Indian Fairy Tales. Ellis & white', London, 1880) পাঞ্জাবি লোককাহিনিরূপে পরিগণিত, অথচ মহান ফরাসি লোকয়নিক কস্‌ক্যাঁ ইতিমধ্যেই এদের অধিকাংশেরই বাঙালি চরিত্র আবিষ্কার করেছেন (M. Emanuel Cosquin : Contes populaires delorraine, Paris 1886, 1890)।

রূপকথার স্থান-কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন শিশু সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরা। শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কিংবা নিছক মাধুর্য সৃষ্টির জন্য রূপকথা রচনা করতে গিয়ে এঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই এমন এক অপকর্ম করছেন যা চিরদিনের জন্য বহু মৌখিক-রূপকথাকে ইতিহাসের অতলে সমাহিত করে দিচ্ছে। এঁরা যতই সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হন না কেন, ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত রূপকথা সঞ্চয় করে একটিকে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে এবং ইচ্ছেমত সংশোধন করে তাদের সব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের পর 'ভারতের রূপকথা' এই অতি সাধারণ শিরোনামার প্রকাশ করছেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এ দেশের বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি থেকে শুরু করে আজকের সাধারণ শিশু সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত বহু বিদেশি রূপকথা উপকথাকে দেশীয় পোশাকে সাজিয়ে উপস্থিত করেছেন। সতর্কতার অভাবে এরা বাংলার সম্পদ বলে গৃহীতও হচ্ছে। দ্রষ্টব্য : 'ভুবনের মাসী', বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, cf. The young Thief and his mother, Fable No. 44, The Fables of Aesop, Ed. by Joseph Jacobs. London 1925; হারাধনের দশটি ছেলে, হাসিখুশী ১ম ভাগ যোগীন্দ্রনাথ সরকার, cf. Ten little nigger, Negro song of USA; ঠাকুরমার ঝুলি : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দেবসাহিত্য কুটির cf. Grimms'Fairy Tales. এই সব বিকৃতির দরুণ আজ আর এইসব রূপকথার প্রথম মৌখিক প্রকাশের সূত্র উদ্ধার সহজসাধ্য নয়। মুখে মুখে বলা ভারতের মৌখিক রূপকথার বিশদ অনুশীলনের কাজে এরা আজ একেবারেই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আঞ্চলিক রূপ অস্পষ্ট করে এদের উপরে এমন এক সাধারণ ভারতীয় চরিত্র আরোপ করা হয়েছে যা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট হওয়ার পূর্বে বস্তুতই এইসব রূপকথায় ছিল না। এসব রূপকথাকে যত বিরাট শিল্পকৃতি বা শিক্ষার সহায়ক বলে মনে করা হোক না কেন, এগুলি নাড়াচাড়া করবার সময় গবেষকদের চরম সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। গভীর মনোনিবেশ সহকারে এই পদ্ধতির অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, অতীত যুগে যেভাবে লোকায়নিক উপকরণসমূহের বিকৃতি করা হয়েছিল আজও সেই প্রক্রিয়া একই ধারায় চলেছে। উচ্চতর শিল্পকৃতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্বদেশেই মানুষের উন্নত সমাজগুলি খাঁটি লোকসংস্কৃতিকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করে। কাজেই দেখা যায়, গবেষকদের যে কেবলমাত্র অতীতের উপকরণ নিয়েই বিব্রত হতে হয় তা নয়, সমকালীন উপকরণের প্রতিকূলতাও তাদের কম অতিক্রম করতে হয় না। এইসব বিভিন্ন কারণে ভারতের যে কোনো অঞ্চলের রূপকথার সঠিক ঐতিহাসিক সময়, ভৌগোলিক অবস্থান ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুবই আয়াসসাধ্য। এইসব সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল অবস্থার কথা মনে রেখেই আমাদের বাংলার রূপকথা (Bengalisch Marchen) অনুশীলনে অগ্রসর হতে হয়েছে।

বাংলার রূপকথার সার-সংক্ষেপ করতে গেলে প্রথমেই এর একটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মৌখিক-রূপকথা এবং লেখা চিরায়ত সাহিত্য-সংগ্রহে জন্তু-কাহিনির (beast tales) যে অতুলনীয় সম্পদ বিদ্যমান এতে কিন্তু তার আপেক্ষিক অনটন লক্ষণীয়। আমাদের এই বক্তব্যকে যেন এই বলে ভুল করা না হয় যে বাংলার রূপকথায় কোনও জীবজন্তুর উল্লেখ নেই বা তারা সেখানে নগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্যাপার মোটেই তা নয়। বরং বাংলা রূপকথায় জীবজন্তুরা এমন এক একটি গল্পের ধারায় (Tale Type) আত্মগত যেখানে মানুষ ও অপ্সরাগণ তাদের সঙ্গে সমভাবে কাহিনির মর্ম-বিন্দুতে অংশভাগী। ধারা-সংগ্রহের পরিভাষায় এর অর্থ হলো—অপেক্ষাকৃত কম বাংলা রূপকথাই প্রথম ৩০০টি ধারার মধ্যে পড়ে, এদের অধিকাংশেরই শুরু ৩০০ থেকে। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ বাংলা লোক-কাহিনিই খাঁটি রূপকথার অন্তর্ভুক্ত (এখানে ধারা-সংখ্যার যে উল্লেখ করা হয়েছে তা Aarne/Thompson-কৃত 'The Types of the Folktale', Helsinki, 1964 অনুসারী)। ডরোথী এ. এল. স্টিভের একটি মন্তব্য এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়ান কালচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন যে, পাশ্চাত্য জগতে ভারতের বিরাটতম দান হলো তার জীবজন্তুর কাহিনিগুলি। ভারতীয় ও ঈশপীয় ধারার জীবকথাগুলির মধ্যে পার্থক্য টেনে তিনি বলেছেন যে ঈশপীয় ধারায় জীবজন্তুরা জীবজন্তুর ভূমিকাই অনুসরণ করেছে। আর ভারতীয় ধারায় এরা মানুষের মতো আচরণ করেছে। ভারতীয় ধারা বলতে শ্রীমতী স্ট্রিডের কথার তাৎপর্য হলো, মানব-সম্পর্কের সামাজিক বিধানগুলি জীবজগতে আরোপিত হয়েছে, আর তার ফলে জীব-জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি ঐতিহাসিক ধারার মানবীয় পশ্চাদপট রচিত হয়েছে।

স্টিডের বক্তব্যের গভীরতাকে অস্বীকার না করেও একটি কথা বলা দরকার, ভারতীয় রূপকথাই যে এক্ষেত্রে একেবারে অনন্য তা কোনোক্রমে বলা চলে না। আফ্রিকান বা আদিম আমেরিকান রূপকথাগুলিতেও প্রায়ই জীবজন্তুকে মানুষের মতো কথা বলানো বা আচরণ করানো হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটি বিরাট ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। ঐ ধারার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়, আফ্রিকান বা আমেরিকান রূপকথাগুলিতে যেখানে আদিম কৌম-সমাজের (Primaitive Tribal Society) ছাপ পাওয়া যায়, ভারতের রূপকথাগুলিতে সেখানে জীবজন্তুকে উন্নত শ্রেণি-সমাজে (Class Society) সংস্থাপন করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই ধারার ভারতীয় রূপকথাগুলি ইতিহাসের বিচারে পরবর্তীকালের। ডরোথি স্টিডের মতে, গ্রিক উপকথাগুলিতে জীবজন্তুরা যদি জীবজন্তুর মতই আচরণ করে তাহলে এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম বৈ আর কিছু নয়, যা আমরা ভারতীয় ও অভারতীয় সব রূপকথাতেই পেয়ে থাকি। এমন কি ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য-ধারাতেই যদি পুরণো লোকায়ত ধারার ন্যায় জীবজন্তুকে মানুষের সঙ্গে আত্মগত করার পথ বিসর্জন না দিতে পেরে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, ভারতের উচ্চতর শিল্পকৃতির উপরে তার লোকসংস্কৃতির প্রভাব কি প্রচণ্ড।

যদি উল্লিখিত বিভিন্ন বিভাগের একটি তুলনামূলক ঐতিহাসিক পারম্পর্য বিচার করতে হয় তাহলে আমরা তাকে নিম্নলিখিত ছকে উপস্থাপিত করতে পারি। এই ছকটি আমার শিক্ষক প্রখ্যাত জার্মান পুরাতাত্ত্বিক ও লোকায়নিক অধ্যাপক ড. হাইন্‌শ মেডে-কৃত।

১. **প্রাচীনতম উপকথাগুচ্ছ :** কৌমধারার সমাজ প্রভাবিত জীবজন্তুর গল্প। এই বিভাগে পূর্বোল্লিখিত আফ্রিকান আমেরিকান জন্তুকাহিনি ছাড়াও কৌম ধারার ভারতীয় কাহিনিগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

২. **উন্নততর সমাজের উপকথা :** ভারতীয় মৌখিক রূপকথা। বাংলার রূপকথাগুলিকে এই বিভাগে ফেলা যায়। এখানে জীবজন্তুর জীবনে উন্নততর সমাজের চিত্রের প্রতিফলন স্পষ্ট।

৩. **ধর্মীয় ও নীতিকথা :** এই বিভাগ ভারতের অধিকাংশ লেখ্য সাহিত্যিক রূপকথা নিয়ে গঠিত। এরা সংস্কৃতিগতভাবে পরিমার্জিত এবং এক উন্নত সমাজের সামাজিক কাঠামোর রীতিনীতি ও ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। তবুও চতুর্থ বিভাগের চেয়ে প্রকৃত লোকশিল্পের সঙ্গে এদের ব্যবধান অনেক কম।

৪. **মনুষ্য সমাজ থেকে পৃথকীকৃত উপকথা :** প্রকৃতি রাজ্যের জন্তু জীবন থেকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত মানব সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সর্বাপেক্ষা উন্নত কাহিনিসমূহ। ঈশপ ইত্যাদির গল্পগুলি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

জীবজন্তুর কাহিনিগুলি এ রকম চারটি বিভাগে বিভক্ত করলেও পরবর্তীকালের ইউরোপীয় রূপকথায় আমরা ভারতীয় (বিভাগ-২) এবং গ্রিক (বিভাগ) উভয় ধারার প্রভাব সম্বলিত দুইটি সমান্তরাল ঝোঁকই দেখতে পাই। জার্মান রাইনেক ফুক্স (Reineke Fuchs) উপকথাগুলিতে (শেয়ালের গল্প), বিশেষ করে গয়টের প্রতিভায় উদ্ভাসিত সংগ্রহে, আমরা এই দুই ধারার একটা অপূর্ব মিশ্রণও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানেও উন্নততর সমাজ-পরিচয় সম্বলিত ভারতের রূপকথা অধিক প্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দুটি সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায়—

১. ভারতের মৌখিক রূপকথাগুলির আপেক্ষিক বয়স।

২. ইউরোপীয় রূপকথার উপর ভারতীয় রূপকথার প্রভাব।

ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে ধারা সুদূর অতীতে চার হাজার বৎসর অবধি অনুসরণ করা যায় (অন্তত হরপ্পা যুগ অবধি) ইউরোপে একমাত্র গ্রিস ছাড়া আর কোথাও তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রিসের সঙ্গে হরপ্পার যে আসমান জমিন ফারাক তাও আমাদের নজর এড়ায় না। সামাজিক উন্নতির শিখরে উঠে গ্রিস ক্রমেই লোকসংস্কৃতির পথ ছেড়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পথে যাত্রা শুরু করে, কিন্তু ভারতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া লোক-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের সাম্প্রতিক যুগ অবধি প্রসারিত। ভারতীয় মৌখিক রূপকথাগুলি একই সঙ্গে তাই এখানকার সাহিত্যিক রূপকথা সংগ্রহের তুলনায় প্রাচীনতর আবার তাদের পরবর্তীও বটে। চার হাজার বছর আগের সামাজিক পরিবর্তনসমূহ ভারতীয় রূপকথাকে সামাজিক অগ্রগতির এই বিশিষ্টতা দান করেছে, যা বাংলার রূপকথায় সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই বাংলার রূপকথায় সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই বাংলার রূপকথা এক গভীর বৈপ্লবিক মানবিকতায় ভরপুর হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বহু পরবর্তীকালে পরিমার্জিত ও পাশ্চাত্যের (বিশেষত পারসিক ও কিয়দংশে গ্রিক) উন্নততর সমাজ-প্রভাবিত ভারতীয়

সাহিত্যিক-রূপকথার ধারাসমূহ একেবারে ভূমধ্যসাগরের তীর অবধি রপ্তানি হতে শুরু করে এবং ইউরোপ পরোক্ষভাবে ভারতীয় লোক-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়।

দীর্ঘকালব্যাপী একাদিক্রমে বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক তদ্রূপ ঘটেনি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে উত্থান ও অবরোহনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট থাকলেও ভারতের লোক-সংস্কৃতি চিরকালই বৈদেশিক প্রভাব-বিরোধী এক দৃঢ় ও স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিল। এই বৈদেশিক প্রভাব-নিরোধের জন্য যে মূল্য ভারতকে দিতে হয়েছে তাকেই বিদেশি ইতিহাসবেত্তাগণ ভারতের ইতিহাস-বিরোধী মনোভাব বলে বিকৃত করেছেন। কিন্তু তাঁরা দেখতে পাননি যে, ইতিহাস থেকে এই পশ্চাদ্বর্তন বিদেশি সংঘাত ও প্রভাব থেকে একটি উন্নত সংস্কৃতির আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল বলেই যুগে যুগে ভারতীয় ধারার রূপকথা তাদের অন্তর্নিহিত মানবতাবোধ ও বৈপ্লবিক চরিত্রের জন্য সারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করতে পেরেছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক নিবিড়তা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে।

ভারতীয় রূপকথার এই বিশিষ্ট পরিবেশে বাংলা রূপকথার আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই নজরে আসে মানুষ, জীব-জন্তু ও অপ্সরাদের অবাধ রূপ পরিবর্তন (অথবা অর্ধ-মানব, অর্ধ-দেবতা রূপগ্রহণ)। প্রধানত রাক্ষস, ভূত, দেবলোকের রমণী বা অপ্সরা এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাংলা রূপকথায় সর্বাপ্রেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এদের আবাস ও আচরণ সর্বদাই মানব সমাজের সঙ্গে তুলনীয়। একটা সূচির পার্থক্য বিভেদের প্রাচীর গেঁথে রেখেছে, মানব-জগতের নায়কগণ এদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, তাদের আক্রমণ করে, আবার কোনও অভীপ্সিত কার্যে তাদের সাহায্যও লাভ করে থাকে। বাংলা রূপকথায় এই দুইটি স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব থাকলেও এদের সঙ্গে তুলনীয় কিংবা এদের কোনও একটি সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিশুদ্ধ জন্তুজগতের অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। জীবজন্তুরা যে মানব জগতে ঘুরে বেড়ায় তা হয় মানুষের, নয় পরীর আকৃতিতে। তারা দেখা দেয় কোনো বিকলাঙ্গ মানুষ অথবা মানুষের অতি-পরিচিত কোনো একটি জীবের অবয়বে পরী হয়ে। এসব দেখে মনে হতে পারে যে-কোনো এক প্রাচীন ও স্বয়ংপ্রধান জীবজগৎ পরী ও দৈত্যদানোর জগতে ক্রমশ বিলীন হয়ে গেছে। ওই প্রথমোক্ত সমাজের যা কিছু ধ্বংসাবশেষ ছিল তা এই নূতন দৈত্য-দানোর জগতে কিংবা নিজেদের সঙ্গী মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে।

এখানেও আবার বাংলা রূপকথাগুলির ঐতিহাসিক অবস্থানের নির্দেশ মেলে, এরা হলো আদিম কৌম-স্তর ও সুস্পষ্ট পৌরাণিক ও ধর্মীয় গণ্ডী দ্বারা সুনির্দিষ্ট পূর্ণবিকশিত শ্রেণিসমাজের মাধামাঝি সময়ের। একথাও বলা চলে যে বাংলার এইসব মৌখিক রূপকথা কতকটা সাবেকি ও অপ্রচলিত ধরণের, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রূপকথার সঙ্গে এখানেই এর মৌলিক পার্থক্য। এই সাবেকিয়ানার (archaic) পরিচয় পাওয়া যায় আর একটি বিষয় থেকে। লক্ষ করলেই দেখা যায় যে বাংলা রূপকথা একদিকে যেমন উচ্চতরশ্রেণির উন্নত সাহিত্যধারার প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত, তেমনই অন্যদিকে তার চারিপাশের সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের রূপকথা জগতের সঙ্গে গভীর শ্রেণিসম্পর্কে একাত্ম।

সাঁওতালদের কথা এসে পড়ায় একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। সাঁওতালী ও বাংলা রূপকথার তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল নজরে পড়বে, কিন্তু সে সকলে মিলে দেখা যায় যে, বাংলা উদাহরণগুলি বুঝতে সুবিধে হয় বেশি এবং তাদের রচনা-শৈলী অনেক বেশি নিটোল। সাঁওতালী রূপকথাগুলি এদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত, কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক আচার-আচরণের জন্য এদের পক্ষে সম্ভবত বাংলা রূপকথা জগতের সূক্ষ্ম বিষয়বস্তুগুলি আত্মস্থ করা সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলা রূপকথা ঐ সব পার্শ্ববর্তী রূপকথা থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তা মোটেই সম্ভব নয়। বাংলার মৌখিকরূপ কথায় আদি শ্রেণিসমাজের গ্রামীণ পরিবেশের যে নিটোল ছবি পরিস্ফুট তার সঙ্গে বর্তমান কালের অতি অগ্রসর সাঁওতাল জীবনও খাপ খায় না। অতীতে এই উভয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিশ্চয়ই আরও বেশি ছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে উভয়ের এই ঘনিষ্ঠতায় অন্য একটি ফললাভ হয়েছে মনে হয়। সুদূর অতীতে আদিম উপজাতীয় শিকারীদের জীবনে চারিপাশের গাছপালা ও জীবজন্তু যেমন মানস-গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছিল ঠিক তেমনিভাবেই এইসব আদিম উপজাতীয় সমাজগুলি তৎকালীন গ্রামীণ বাসিন্দাদের কোনো কোনো দিক থেকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। বাংলা রূপকথার দৈত্য-দানব ও অপ্সরাজগতের ক্রমপরিবর্তনশীল ধারণার মূলে হয়তো তারা আদর্শের কাজ করেছিল। পার্শ্ববর্তী কৃষক প্রতিবেশীদের প্রতি এই সব উপজাতিদের নিয়ত পরিবর্তনশীল মৈত্রী বা বৈরীভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকতে পারে বাংলার বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মৌখিক রূপকথার ধারায়, যাতে কখনও রাক্ষসেরা হিংস্র হলেও বন্ধুরূপে চিত্রিত। আবার কখনও রক্তপিপাসু এমন ভয়াল ভয়ংকররূপে অঙ্কিত সে পশুশক্তি কিংবা চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ছাড়া তাদের দমন করা যায় না। তবে মনে রাখা দরকার, এই জাতীয় প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার পূর্বে শেষকথা বলা সম্ভব নয়।